এ শরীরের কিন্তু দেখা না দেখার কোন প্রশ্নই নাই। পাঠাদির বেলায়ও ঐ রকমই। আবার ইহাও হইত যে পুস্তকের যে স্থানটির উপর এ শরীরের লক্ষ্য পড়িত সেটাই প্রশ্ন আসিত।

একদিন স্কুলে ইন্‌স্পেক্টর আসিয়াছেন। সকলে ভাল-ভাল কাপড় পরিয়া গিয়াছে আর এই শরীর ছেঁড়া বইখানি, ভাঙ্গা শ্লেটের টুকরা, নিত্য যেমন ময়লা ছেঁড়া কাপড়াদি পরিয়া, সেই সব নিয়া স্কুলে উপস্থিত হইয়াছে। ইন্‌স্পেক্টর আসিয়া সুন্দর পোষাক পরা মেয়েদের দিকে চাহিয়া পুস্তকের এক জায়গায় দেখাইয়া একে একে বলিলেন — এইটি পড়। তাহারা থামিয়া থামিয়া পড়িল। সকলের পরে এই শরীরের পালা আসিল। বলা মাত্রই এই শরীর তাড়াতাড়ি পড়িয়া গেল। ৫/৭ লাইন পড়িতেই ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, — বেশ। আর দরকার নাই। পরে তিনি লিখিতে বলিলেন। মাষ্টার মহাশয় উপস্থিত লিখিবার জন্য এই শরীরকে একটি ভাল শ্লেট আনিয়া দিলেন; ইন্‌স্পেক্টর যে পাঠটি বলিলেন তা এই শরীরের খুব জানা। তিনি এই শরীরের নির্ভুল লেখা দেখিয়া প্রশংসা করিলেন। ক্রমে ক্রমে এই শরীরের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইয়া গেল।

খেওড়া স্কুলের মাষ্টার মহাশয় মারা গেলে তাহার স্থানে এক শিক্ষয়িত্রী পড়াইতে আসিলেন। তিনিও সম্পর্কে এই শরীরের দিদিমা ছিলেন। একদিন সেখানে ইন্‌স্পেক্টার আসিবে। ছাত্রী সংখ্যা বেশী দেখাইবার জন্য তিনি এই শরীরকে স্কুলে ডাকিয়া নিলেন। সকলের সঙ্গে বসাইয়া দিলেন। এই শরীর তখন লেখাপড়ার কোন ধারই ধারে না। ইন্‌স্পেক্টার কি এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে দিদিমা বাহির হইতে আড়ালে থাকিয়া তাহার জবাব লিখিয়া দেখান। এ শরীর উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল — অ্যাঁ? কি দেখাচ্ছেন? তখন তিনি জিভ কাটিয়া সরিয়া গেলেন। যাহা হউক, ইন্‌স্পেক্টার যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহার জবাব এই শরীরের কি রকম করিয়া ঠিকমতই হইয়া গিয়াছিল। পরে ঐ দিদিমা এই শরীরকে গায় হাত দিয়া বলেন যে ১১ বৎসর বয়স হইতে চলিল এখনও তোর বুদ্ধি হইল না? ঐ রকম করিয়া কি বলিতে আছে? এই শরীর বলিল — আপনারাই না মিথ্যা কথা বলিতে নিষেধ করেন — এটা মিথ্যা হয় না?

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## বিবাহ

এই শরীর যখন বড় হইতে লাগিল তখনও কাহারও সহিত আপন পর ভাব ছিল না। সকলের সঙ্গেই সরলভাবে হাসিয়া খেলিয়া চলিত। খেওড়ার সম্পর্কে অনেকে দাদামহাশয় ছিলেন, তাহাদের সঙ্গে শিশুর মত আদর আবদারে এই শরীরের দিন কাটিত। একদিন এই শরীরের মা বলিলেন — বড় হইয়াছিস্, এইরকম ভাবে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করে না। বয়স বেশী হইলে মেয়েদের পুরুষকে ছুঁইতে নাই, হাসি তামাসা করিতে নাই। কাহারো মুখের দিকে তাকাইয়া কথা বলিতে নাই। সেদিন হইতে এই শরীরের চলাফেরা আপনা আপনিই যেন পরিবর্তিত হইয়া গেল।

আবার একদিন বিশেষ আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসায় মা বলিতে লাগিলেন — ১২ বৎসর বয়স হইলে এ শরীরের বিবাহের জন্য বাবা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এ শরীরের ছোট মামা কোষ্ঠী দেখিতে জানিতেন। তিনি কোষ্ঠী দেখিতে নিয়া বারবার চাওয়া সত্ত্বেও ফেরৎ দেন না। এই কারণে পিতামাতা ভাবিতেন কি জানি কোষ্ঠীতে বোধ হয় কিছু বিরুদ্ধ আছে। বিদ্যাকূটের কাশ্যপ গোত্র, ভট্টাচার্য বংশ প্রসিদ্ধ ও সম্মানীয়। তাহারা বিক্রমপুর ভিন্ন অন্যত্র কন্যাদান সহজে করিতেন না। অন্য দেশ হইতে ভাল ভাল সম্বন্ধ আসিল, কিন্তু সে সব ফিরাইয়া দিলেন। অবশেষে বাবা পাত্রের সন্ধানে নিজেই বিক্রমপুর গেলেন।

এদিকে ঠাকুরমার খুব অসুখ হইল। একদিন হঠাৎ দৌগাছির শ্রীযুক্ত সীতানাথ কুশারী মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া বাবা বাড়ীতে আসিলেন। তিনি ভোলানাথের বড় ভগ্নীপতি। সম্বন্ধাদি একরকম পাকাপাকি করিয়াই কুশারী মহাশয় এই শরীরকে ডাকিয়া কথাবার্তা বলিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। পরে একটি শুভদিন দেখিয়া আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ইহার পর ঠাকুরমা দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার শ্রাদ্ধাদি হইয়া গেলে মাঘ মাসে বিবাহের দিন ধার্য হইল। বিবাহের প্রস্তাবে গ্রামের

সম্পর্কীয় বুড়াবুড়ি ও সমবয়সীরা কত কি ঠাট্টা তামাসা করিতেছে কিন্তু এই শরীরের একই ভাব। কেবল কানে শুনিয়া যায়। ১২ বৎসর ১০ মাস বয়সে বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের সময় যেইরূপ বলিল সেইভাবে উঠিয়া বসিয়া এই শরীর সকলকে আনন্দ দিল।

বিবাহের পরদিনই ভোলানাথের দাদা যেখানে কাজ করিতেন সেইখানে নিয়া গেলেন। তিনি শ্রীপুরের স্টেশন মাষ্টার ছিলেন। খেওড়া হইতে বিদায় হইবার সময় সকলে কান্নাকাটি করিতেছে। এ শরীরও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া অস্বাভাবিক কান্না কাঁদিল। কেহ কেহ বলিল যে এমন করিতে ত কাহাকেও দেখি নাই। এ শরীর ত, ব্যস! যখন যেখানে যাহা হইয়া যায়।

## ভাসুরের সংসারে মা

খেওড়া হইতে আসিবার সময় শরীরের মা বলিয়াছিলেন — সতীধর্ম সর্বদা রক্ষা করিবে। তাহা হইলে দেবতারাও ভয় করে। নিজের জীবন উৎসর্গ করিবে তবু সতীধর্ম ছাড়িবে না। স্বামী বা অভিভাবকেরা যখন যাহা বলেন নির্বাক হইয়া পালন করিবে। বিবাহের পরে ভোলানাথ চাকুরীস্থলে চলিয়া গেলেন। তিনি এ শরীরকে বলিয়াছিলেন — আমার ভাই ও ভাই-এর স্ত্রীর কথা মানিয়া চলিবে। শ্রীপুর আসিয়া এই শরীর দিবারাত্রি সংসারের কাজকর্ম নিয়া থাকিত। রান্নাবান্না, ভাসুরের* ছেলেপিলের যত্ন, গৃহাদি পরিষ্কার, বাসন-মাজা, কাপড় কাচা, সব রকম গৃহস্থালী এই শরীর কলের মত একা করিয়া যাইত। কাজের ভীড়ে এই শরীরের খাওয়া দাওয়া, মাথা আঁচড়ান, গা পরিষ্কার করা কিছুই খেয়াল হইত না।

আশুর† বাবার খুব অসুখ হইল। চিকিৎসা করাইবার জন্য সকলে ঢাকা গেলেন। সর্বদা জল ঘাঁটিয়া কাজ করিতে করিতে এই শরীরের হাতে ও পায়ের আঙুলে ঘা হইয়া গেল। ঢাকা হইতে সকলে আটপাড়া গ্রামে তাহাদের বাড়ীতে গেলেন। এই শরীরের হাতে পায়ের ঘা দেখিয়া পাড়ার অনেকে বলিত — তুমি কেমন? তোমার

* রেবতীমোহন চক্রবর্তী।

† মায়ের ভাসুর রেবতীবাবুর পুত্র।



কি ব্যথা বেদনাও লাগে না? তুমি কি মানুষ নও? এই সব বলিয়া তাহারা দুঃখ করিত। তাহারা জানিত না এই শরীরের উপস্থিত কর্তব্য — আদেশ পালনের দ্বারা সেবা।

আশুর বাবার অসুখ কমিলে সকলে শ্রীপুর আসিলেন। তিনি এই শরীরকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। তখনকার দিনে ভাসুর ভ্রাতৃবধূর সম্বন্ধের ভিতর দূরত্বের বিধান থাকা সত্ত্বেও তাঁহার প্রতি এই শরীরের সেবার ত্রুটি ছিল না। শ্রীপুরে অসুখ বাড়িয়া যাওয়াতে তিনি আবার আটপাড়া গেলেন। সে সময়ে বাবা আসিয়া এই শরীরকে খেওড়া নিয়া গেলেন। বাবা মার সঙ্গে কয়েকমাস থাকিয়া নরুন্দি স্টেশনে আশুর বাবা পুনরায় কাজে হাজির হইলে আশুর মায়ের সহিত এ শরীর আবার সেখানে গেল।

নরুন্দির এ্যাসিস্টেন্ট স্টেশন মাষ্টারের পরিবার তথায় প্রথম আসিলে তাহার বাসা হইতে এই শরীরকে রান্নাঘরে দেখিতে পাইল। পরে যখন আশুর মার সঙ্গে সে দেখা করিতে আসিল তখন বলিল — আপনাদের রান্না ঘরে সেই দিন একটি বউ দেখিয়াছিলাম সেইটি কোথায়? আশুর মা বলিল — এই ত। সে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চাহে না। সে বলে — সেই দিন দিব্য রূপবতী দেবী প্রতিমার মত একজনকে দেখিয়াছিলাম। ইহার সঙ্গে তো মিলে না।

তাহারা নরুন্দি হইতে চলিয়া গেলে সে জায়গায় একজন মুসলমান কর্মচারী আসিল। তাহার বোন এ শরীরের সঙ্গে তাহাদের ধর্মের অনেক ভাল ভাল কথা আলোচনা করিত। তাহাতে খুব আনন্দ প্রকাশ পাইত। যেন কোনও ভিন্ন ধর্মের প্রশ্নই ছিল না, কথার ভাব ইত্যাদি এমনই ছিল।

শিশুকাল হইতে কোন কোন সময় কিছুক্ষণের জন্য এই শরীরের এমন একটি প্রকাশ হইত যে ইহা আছে কি নাই এবং কোথায়ই বা নাই; সাময়িক শরীরও গায়েব। কাহারো মুখের কথা — তাহাদের দৃষ্টিপথেও নাকি ঐরূপ চমক লাগিত এই ভাব। এইরূপ সময়ে কর্মাদিতে থাকিলে সবই যেন কেমন হইয়া যাইত। এইরূপ ভাবের কথা কাহাকেও জানাইতে মুখে বাহির হইত না।

অনেকদিন সামান্য সামান্য ব্যাপারেও এইজন্য অর্থাৎ তাহাদের না বোঝার দরুণ এ শরীরকে কটূকথা শুনিতে হইত। কারণ কোনও কোনও গৃহস্থাশ্রমে যেমন কেহ অন্যায় করিল, তাহাদের

দৃষ্টিতে, অন্যের দোষ আসিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িল, অর্থাৎ দোষ চাপাইয়া দিল। অপরের দোষ আসিল বলিয়া এ শরীর তো আর কিছু বলিত না, চুপ করিয়া শুনিয়া যাইত, পরে তাহারা বুঝিত, কিন্তু এ শরীরের তো একই ভাব থাকিত। যে যাহাই বলুক চুপ করিয়া শুনিয়া যাইত। নিজের যাহা কর্তব্য কর্ম তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আনন্দে করিয়া যাইত। এ শরীর জানিত সংসারের এই রূপ। জগতের সকলে সংকে সার করিয়া যার জন্য যথানির্দিষ্ট রহিয়াছে তাহা করিয়া কর্মক্ষয় করিয়া যাইতেছে।

## বিদ্যাকূটে

১৩২০ বাংলার জ্যৈষ্ঠমাসে বিদ্যাকুট হইতে অষ্টগ্রাম যাই। তখন এ শরীরের বয়স প্রায় ১৮ বৎসর। এই সময়ে বিদ্যাকুটে এ শরীর যখন ঘোরাফিরা করিত তখন দেখি বাঁদিকে চোখের কাছে একটি নক্ষত্রের মতো আলো প্রায়ই ফুটিয়া উঠিত। হরিনাম করিবার ভাব ইত্যাদি সেই সময়কালীন। এক সময় ইহাও হইয়াছিল বিদ্যাকুটে ঠাকুর ঘরে, যেখানে শালগ্রামশীলা সেখানে সকালবেলার দিকে কোন্ কোন দিন এ শরীর ঢুকিয়া চুপ করিয়া এক কোনে বসিয়া পড়িত। একদৃষ্টিতে ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া থাকিত, কেমন একভাবে। তখন দেখিত সিংহাসনের ভিতরের ঠাকুর সিংহাসনের উপরেই বসা — যেমন পুজার সময় আসনে বসা থাকেন। কখনও গাঢ় সবুজ, ক্রমশঃ নীল — বেশ জ্যোতিঃপূর্ণ চারিদিকে কিরণ ছড়াইয়া বসিয়া আছেন। তখন খেয়ালই থাকিত না, ঠাকুরকে ত পূজা করিয়া গতরাত্রে শয়ন দেওয়া হইয়াছে। এখনও ঠাকুরকে জাগানো হয় নাই। এ জায়গায় উপস্থিত কি করিয়া? পরে দরজা খুলিয়া সকলের সঙ্গে দেখিলে দেখা যাইত, ঠাকুর এ জায়গায় নাই। সেই সিংহাসনেই নিদ্রিত। ইহা অবশ্য এ শরীরের সাধনার খেলার খেয়ালটা যখন আসিয়াছিল, সেই সময়কালীন। সেই ঠাকুর দাদামহাশয় ও অন্যান্য সরিকেরা পালা করিয়া পূজা করিতেন। পরে এইসব সরিকেরা অন্যত্র চলিয়া যাওয়ায় এবং দাদামহাশয়ও বাড়ীতে না থাকায় ঐ ঠাকুরকে অন্য কোন জায়গায় রাখিয়া আসা হয় — বহু বিগ্রহের সঙ্গে। ঠাকুরের নাম রাজরাজেশ্বর।



রম্না আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইলে পরে দাদামহাশয় এই বিগ্রহ অন্যান্য বিগ্রহের মধ্যে হইতে খুঁজিয়া আনেন। কাশীতে অন্নপূর্ণার সহিত এই বিগ্রহের পূজা হইতেছে।

বিদ্যাকূটেই যে সময় এ শরীর ছিল, তখন অন্যান্যরা লক্ষ্মীপূজা করিত। মায়ের আগ্রহে একবার লক্ষ্মীপূজার ব্যবস্থা হয়। বাজিতপুরে এ শরীর যখন আসে তখন একদিন ভোলানাথকে একটি ঘটের আকার দেখাইয়া ঐ জাতীয় একটি ঘট আনিয়া দিতে বলিল। ভোলানাথ অনেক খুঁজিয়া ঐ প্রকার ঘট না পাইয়া আসিয়া বলিলেন — তুমি যে রকম বলিলে, একটাই দোকানে পুরানো সেই রকম একটি ঘট দেখিয়াছি। আনিব কি? বলিলাম — সেইটিই ত। সেই পুরানো ঘটটিই আন, ঐটির জন্যই ত বলা। দেখা গেল ঘটটির গায়ে সিন্দুর এবং বহুকালের পূজার চন্দনের ছিটার দাগ পড়িলে যেমন, তেমনটি। তাহার আর ধাতুর রং দেখা যায় না। এই শরীর তাহা দেখাইয়া বলিল — দেখিলে, এই ঘটে বহুকাল পূজা হইয়াছে। সেইটি বিশেষ করিয়া নিজের হাতে মাজা হইল। তাহাতেই এ শরীরের লক্ষ্মীপূজা চলিতে লাগিল।

বেশ কিছুদিন পরে সাহবাগে আসিলে যখন এ শরীরের পড়িয়া থাকার দিক, তখন দিবারাত্র কোথা দিয়া চলিয়া যাইত। বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীপূজার সময়মত এ শরীরের পূজা হইয়া উঠিত না। প্রায়ই বৃহস্পতিবারটি এইরকম ভাবের ভিতর দিয়াই অতিবাহিত হইয়া যাইতে লাগিল। প্রতি বৃহস্পতিবারে আর পূজা হইয়া উঠে না। একদিন বৃহস্পতিবারে রাত্রিকালে এ শরীরের খেয়াল হইলে বলিল — চল, আম্রপল্লব তুলিয়া আনি। ভোলানাথ বলিলেন — তুমি এখন এই রাত্রে উঠিলে — পূজার যোগাড় কোথায়? রাত্রে তো আম্রপল্লব তুলিতে নাই। এ শরীর ত দিবা-রাত্রির মধ্যেই নাই, কেমন এক ভাব — ঢলঢল। একবার চোখ খোলে, আবার চোখ বন্ধ হয়, কখনও অর্দ্ধোন্মিলিত। কখনও ছেলেমানুষের মত হাসে, চোখে জল, চোখে মুখে রক্তিমাভা। কখনও বা আধো আধো কথা। কখনও বা কি এক ভাবে দাঁড়াইয়া আছে — কথা বাহির হইতেছে না। ভোলানাথকে বলিল — পূজা তো করিতেই হইবে। চল, তুমি আম্রপল্লব তুলিও না। এই বলিয়া ভোলানাথের সঙ্গে আমতলায় গিয়া হাত বাড়াইয়া বলিল — এই শরীর তুলিতেছে। ইহাতে যদি

পাপ হয়, তবে এখানে এমন অপূর্ব স্থিতি — পাপ পুণ্য, সময় অসময়, বিধি নিষেধের গণ্ডি, বন্ধন — এখানে প্রকাশ কই? পূজা করিতে গিয়াও ঐভাব, দীর্ঘ সময় নিয়া কোনও রকমে সমর্পণ।

অটলবাবু* সাহবাগে আসিয়াছিল। এ শরীর তাহাকে বলিল — এ শরীরের তো প্রতি বৃহস্পতিবারে পূজা হইয়া উঠে না, তুমি কি এই ঘটটি নিবে? সে অতি আগ্রহের সহিত নিল। সে ও তাহার স্ত্রী আগ্রহের সহিত তাহাতে পূজা করিতে লাগিল।

অষ্টগ্রাম যাইবার পূর্বে বিদ্যাকূটে একদিন বারান্দায় বসিয়া বেতের দ্বারা অক্ষর বুনটে তুলিয়া পাখা বানাইতেছি। তখন দেখি এ শরীরের ছোটমামা (৺সারদা চরণ বিদ্যাসাগর) আসিয়াছেন। তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিবার পর পাখা দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন — এ কঠিন কাজ। সময় লাগে ও বুদ্ধি খাটাইতে হয়।

এ শরীর অনেকদিন যাবৎ বিদ্যাকূটে আছে। কিন্তু তাঁহার শরীর বড় ভাল নয়। এ জন্য এ শরীরকে এতদিন দেখিতে আসিতে পারেন নাই। ছোট সময়ে এ শরীর তাঁহাদের বাড়ী গেলে একটি গাছের কাঠাল নাকি আনন্দ করিয়া খাইত। তাহার ছায়ায় হাঁড়িত ও পাতা নিয়া খেলা করিত। সে গাছটি বহু পুরানো। কোন বৎসর এত ফল দিত যে গোড়া হইতে মাটি ফুড়িয়া ফল বাহির হইত। ফলও বেশ বড় হইত। মামা আসিতে এ শরীরের জন্য সেই গাছের একটি কাঁঠাল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি নিয়া আসিয়াছেন। কিছুক্ষণ বসিয়া 'আমি এখন পূর্বপাড়া যাই' এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। সেখানে তাঁহার মামাতো বোনের মেয়ের বিবাহ।

পরের দিন এ শরীরও সেই বাড়ী গেল। নিমন্ত্রণের খাওয়া দাওয়া শেষ হইতে—বেলা পড়িয়া গেল। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে। অন্ধকার প্রায় হইয়া আসে। এই শরীরের সঙ্গে ছোট এক ভাই ও দুই বোন ছিল। এই শরীর মামাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া দেখা করিয়া জানাইল যে এ শরীরকে একা একা বাড়ী যাইতে হইবে। শুনিয়া বলিলেন — আমি কি তোমাদের সঙ্গে যাইব? এ শরীর চুপ করিয়া রহিল দেখিয়া তাড়াতাড়ি কাপড় চোপড় নিয়া বাহির হইলেন।

* অটলবিহারী ভট্টাচার্য—অধ্যাপক রাজশাহী কলেজ।



তাঁহার অম্বলের ব্যথা ছিল। শেষ বেলায় খাওয়ার পর আরাম করিয়া একটু শুইয়া ছিলেন। বিয়ে বাড়ীতে তখনও মেয়ে জামাই-এর নমস্কারী লৌকিকতা ইত্যাদি শেষ হয় নাই। সঙ্গে যাইবার তেমন কেহ নাই দেখিয়া বোধহয় মামা আমাদের সঙ্গে চলিলেন।

এ শরীরের খেয়াল হইতেছিল যে মামাকে নিয়াই বাড়ী যাইবে। পরে রাস্তায় চলিতে চলিতে বৃষ্টি থামিয়া গেল। বাড়ীতে মা মামার জন্য অন্য একটি ঘরে শোয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আমরা সকলে শুইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি মার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। মা এবং অন্যান্য সকলে উঠিলেন। দেখিলাম মামা কাতর স্বরে বলিতেছেন, — আমাকে বারান্দায় একটি বিছানা করিয়া দে। মা তাহাই করিলেন। বেদনা এবং শরীরের অত্যন্ত গ্লানি ও ক্রমশ পরিবর্তন দেখিয়া মা কবিরাজ ও পাড়ার বিশেষ বিশেষ কয়েক জনকে ডাকাইয়া আনিলেন। কবিরাজের ঔষধে কোন ফল দেখা যাইতেছে না। অবস্থাও মন্দের দিকে চলিয়াছে। মা ইহা দেখিয়া ডাক্তারের নিকট লোক পাঠাইবার কথা বলিলে তিনি বলিলেন — না, আমি তোদের এইখানেই মরিব। এখনই মরিব। অথচ তিনি সকলের সঙ্গে বেশ কথা কহিতেছেন এবং দেব দেবীর নাম, তাঁহার পিতৃপুরুষ ও গুরুজনদের নাম এই শরীরের বাবার পিতৃপুরুষগণের নাম নিতে নিতে প্রণাম করিতেছেন। পরে বলিলেন — আমার নাভি পর্যন্ত ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছে। সময় নিকট। ইহা শুনিয়া এই শরীরের এক দাদা যাইয়া দেখিলেন সেই অবস্থা। তিনি তাঁহার পা ঘসিয়া দিতে লাগিলেন। মামা বলিয়া উঠিলেন — আপনি বৃদ্ধ পণ্ডিত, উচ্চবংশের সন্তান, আমার পা আপনি ধরিলেন! এই বলিতে বলিতে সকলের দিকে মুখ তুলিয়া হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিলেন, আর অমনি তাঁহার দেহত্যাগ হইল। তিন চার ঘণ্টার মধ্যেই এই ঘটনা ঘটিয়া গেল। মা কাঁদিতে লাগিলেন। এই শরীরের কিন্তু কান্না আসিল না। এ বাড়ীতে যে একটা বিপদ হইয়া গেল তাহার কোন প্রকাশ পাইল না। পরদিন পাড়ার কেউ কেউ যখন মামার মৃত্যু বিবরণ জিজ্ঞাসা করিল, এ শরীর সব বলিল। তখনও দুঃখের কোন প্রকাশ হইল না। এ শরীর দেখিতেছিল, অনেকে চুপি চুপি বলাবলি করিল যে, ইহার যেন মায়া মমতা কিছুই নাই।

## ভোলানাথের কর্মস্থল অষ্টগ্রামে

পরের দিন প্রাতে ভোলানাথের চিঠি আসিল যে কাল তিনি বিদ্যাকূটে পৌঁছিবেন। বিবাহ হইয়াছে অবধি ভোলানাথ আর বিদ্যাকূটে আসেন নাই। কারণ অভাব অনটনের দরুণ তাঁহাকে আনিতে পারেন নাই। ভোলানাথ আসিলেন। কয়েকদিন যাবৎ পিতা বাড়ীতে ছিলেন না। তিনি আসিলে ভোলানাথ সহ অন্যান্য সকলে মিলিয়া নৌকায় সুলতানপুর মামাবাড়ী গেলেন। শুনিয়াছি সুলতানপুরে এ শরীরের মাতুল বংশ খুব প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত। এ পরিবারে অনেক পণ্ডিত, ক্রিয়াবিদ ব্যক্তি ও সাধক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং এক ধর্মনিষ্ঠ স্ত্রী আনন্দে হরিনাম করিতে করিতে স্বামীর সহিত সহমৃতা হইয়াছিলেন।

ভোলানাথের ছুটি ক্রমে ফুরাইয়া আসিল। মামাবাড়ী হইতে বিদ্যাকূট আসিয়া কয়েকদিন পর এ শরীর ভোলানাথের সহিত তাঁহার কর্মস্থল অষ্টগ্রামে আসিল। সেখানে জয়শঙ্কর সেন নামক এক ভদ্রলোক ছিল। তাহার পরিবারে সারদা নামে একটি ছেলে ও তাহার শালা হরকুমার। সে বাড়ীতে কয়েকখানি ঘর ছিল। আমরা তাহার একটিতে উঠিলাম। ভোলানাথের সঙ্গে মধুবাবু নামক এক কর্মচারী পরিবারসহ কয়েকদিন ছিলেন। এই শরীর যেই দিন অষ্টগ্রামে গেল সেইদিনই ভোলানাথ একটি নাকের ফুল বাক্স হইতে খুলিয়া পরিতে দিলেন। এ শরীর পরিল, ও বিদ্যাকূট হইতে তৈয়ারী একটা নাকের ফুল যাহা নাকে ছিল, সেটি খুলিয়া রাখিল। একদিন মধুবাবুর স্ত্রী ঐটি দেখিয়া পছন্দ করাতে এ শরীর তাহার নাকে পরাইয়া দিল। পরে ভোলানাথ যখন ইহা শুনিলেন, এ শরীর গায়ের সোনা অপরকে দিয়াছে তখন রাগ করিলেন। তখন খেয়াল হয় নাই যে কাহাকে কোন জিনিষ দিলে ভোলানাথ বিরক্ত হইবেন। এ শরীর বলিল — আচ্ছা অন্যায় হইয়াছে। জিজ্ঞাসা না করিয়া গায়ের সোনা আর কাহাকেও দিব না।

জয়শঙ্কর সেনের স্ত্রী আমাকে একদিন বলে সকলের সন্তান আছে, তাহাদিগকে অমুকের মা বলিয়া ডাকি। তোমার হাসিটাকে খুশী নাম দিলাম। ঐ তোমার সন্তান কেন না তোমাকে কোন সময়ই আমি এ পর্যন্ত বেজার হইতে দেখিলাম না। সর্বদা যেন হাসিখুশী লাগাই



আছে। তোমাকে খুশীর মা বলিয়া ডাকিব। তখন হইতে সেখানে সকলে এ শরীরকে খুশীর মা বলিত ও খুব ভালবাসিত।

ক্ষেত্রবাবু নামক এক কর্মচারীও জয়শঙ্কর সেনের বাড়ীতে ছিল। শুনিলাম মধুবাবুর স্ত্রী ও ক্ষেত্রবাবুর স্ত্রী জয়শঙ্কর সেনের স্ত্রীকে মা ডাকে। উহাদের মেয়ে নাই বলিয়া তাহার সহিত ধর্ম-মেয়ের মত তাহারা ব্যবহার করে। এ শরীর তাহাকে মাসীমা ও অপর সকলে তাহাকে দিদি বলিত। হরকুমারকে সকলে মামা ডাকে। এ শরীরও তাই সময়ে সময়ে কথা প্রসঙ্গে কাহারও সঙ্গে বলে, তবে তাহার সঙ্গে কথা বলে না। ঘোমটা দিয়ে থাকে।

## হরকুমারের ভবিষ্যৎ বাণী

হরকুমার একদিন এ শরীরের ঘরে আসিয়া বলে আমার মা অল্পদিন হয় মারা গিয়াছে। এইঘরে এখানেই থাকিত। তুমিই আমার মা — এই আবার আমার মা ঘরে আসিয়াছে। এবার কিন্তু আমাকে ষষ্ঠীর কাগড় দিতে হইবে। সে অবধি হরকুমার আমাকে মা বলিয়া ডাকিত। ষষ্ঠীতে ভোলানাথ তাহাকে কাপড় দিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে খুব ভালবাসিতেন। তাঁহার হিসাবপত্র সে রাখিত। আমাদের অসুখ অসুবিধা সর্বদা লক্ষ্য করিত। ইহা দেখিয়া কাহারো কাহারো ভাল লাগিত না। পূর্বে তাহার চাকুরি ছিল, এখন নাই, চেষ্টা করিতেছে। তাহার স্ত্রী মেয়েরাসহ বাপের বাড়ী আছে।

জয়শঙ্কর সেন, তাহার স্ত্রী ও হরকুমার এ শরীরের রান্না ও কাজকর্ম খুব পছন্দ করিত। তাহারা পেঁয়াজ খাইত, বলিত তাহা না হইলে খাওয়া যায় না। কিন্তু এখানে পেঁয়াজ ইত্যাদি খাওয়ার ব্যবস্থা আদৌ ছিল না। কোন কোন দিন এ শরীরের রান্না ডাল তরকারী তাহাদের দেওয়া হইত। তাহারা বেশ তৃপ্তির সহিত খাইত। ক্রমে ক্রমে তাহারা পেঁয়াজ ইত্যাদি ছাড়িয়া দিল। একদিন কি কি রান্না করিয়াছে, ভোলানাথ খাইতে বসিয়া এ শরীরকে বলে জয়শঙ্কর সেন খাইতে বসিয়াছে। তাহাকে ডাল একটু দিয়া আস ত। এ শরীর তাহাই করিল। পরে ভোলানাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন — আজ দেখিব, রোজই বাবাজী বলেন খুশীর মার মত কেহ রান্না করিতে পারে না। দেখি ডাল খাইয়া আজ কি বলে। পরে

জয়শঙ্কর সেনকে ডাকিয়া বলেন — কি! আজ ডাল কেমন হইয়াছে ? খুশীর মার মত ডাল রান্না কেউ নাকি আর করিতে পারে না। জয়শঙ্কর সেন তাহা শুনিয়া বলিল কেন কি হইয়াছে ? বেশ ত ভালই হইয়াছে। ভোলানাথ বলিল — আপনি পক্ষপাতিত্ব করিতেছেন। ডালে ত লবণ একেবারেই দেয় নাই। সে তবুও বলে আপনি ঠিক বলিতেছেন না। আমাদের খুশীর মাকে মিছামিছি জব্দ করিতেছেন। পরে জানা গেল তাহার মুখে সত্য সত্যই আলুনি লাগে নাই, অথচ ডালে বাস্তবিকই লবণ ছিল না।

হরকুমার একদিন কি জিনিসের কথা জিজ্ঞাসা করে। আমি হাতে ইঙ্গিত করিয়া বুঝাইতে গেলে সে বোঝে না ও বলে — মা! তোমাকে এক বছর যাবত মা বলিয়া ডাকিয়া আসিতেছি। আর কত অনুনয় বিনয় করিতেছি, কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে কথা বল না। এইভাবে যদি পাথরের চিন্তা করিতাম, এই রকম করিয়া মা ডাকিতাম, তাহা হইলে পাথরেরও চৈতন্য হইত এবং কথা বলিত। এই বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল। ভোলানাথ পূর্বে একদিন উহার সহিত কথা বলিতে বলিয়াছিলেন। আমি ততটা খেয়াল করি নাই। সেইদিন আবার বলিলেন। তখন হইতে তাহার সহিত কথা বলিতাম।

ইহার পূর্বেও প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সে প্রণাম করিয়া যাইত। আমি খাইতে বসিলে প্রসাদ দাও, প্রসাদ দাও বলিয়া শিশুর মতো পাতের কাছে বসিয়া থাকিত। না পাইলে উঠিত না। প্রায় রোজই আমার রান্না তরকারী নেওয়া তাহার এক নিত্য কর্ম ছিল। কোন কোন সময় আমাকে বলিত — আমি মা ডাকি। দেখবি মা, একদিন জগতের লোক তোকে মা ডাকিবে। তোকে ত কেহই চিনিতেছে না। একদিন আব্দার করিয়া বলিয়াছিল — মা! আমার একটা নাম রাখ। আমি বলিয়াছিলাম তোমার নাম 'হরিবোলা'। শুনিয়া খুব আহ্লাদিত হইয়াছিল। সে বেশ নাম-কীর্তন করিত। পরে অন্য কোথায় চাকুরী করিতে সে চলিয়া গেল। মাঝে মাঝে পত্র দিত। তাহাতে প্রথম পাঠ ছিল 'মা দেবী'। হরকুমারের সত্য কথা বলার দিকটাই প্রবল ছিল। পরে যখন বাজিতপুরে যাই, তখন তথায় দেখিলাম হরকুমার পাগল হইয়া গিয়াছে। পাগলও সে হরিনামের। পাগল ভগবৎ কথা ছাড়া আর কোন কথা থাকিত

সমাধির আবেশে

শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে ভাইজী



না। সে অবস্থায়ও তাহার ভাবগুলি বড় শান্ত ও সুন্দর দেখা গিয়াছিল।

## দেবালয়ে একাত্মভাব

সন্নিকট গ্রামে ব্রহ্মাণী দেবীর এক মন্দির ছিল। একদিন এ শরীরকেও সেখানে নিয়া যাইবে। কাপড় চোপড় পরিয়া বাহির হইতেছি এমন সময় ক্ষেত্রবাবু নামে ভোলানাথের বন্ধুস্থানীয় এক ভদ্রলোক এ শরীরকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিল আমার দেব দর্শন হইয়াছে। প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

আমরা ব্রহ্মাণী মন্দিরে গেলে হঠাৎ এ শরীরের একটা অস্বাভাবিক ভাব হইল। উহা অনেকে লক্ষ্য করিল। এ শরীর সর্বরূপ, মূর্তি ইত্যাদির সহিত একই আছে ত — বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবেতে ও দেবীতে একই। এই ভাবের বাহ্যিক প্রকাশটাও কেমন যে হইয়া পড়িত, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। অপরের ন্যায় মূর্তির সম্মুখেই প্রণামের ক্রিয়াদি হইল না। শরীরটা অসাড় ভাবে রহিল। বাহিরে টর্চ লাইটের মত প্রকাশ অপ্রকাশ উভয় অবস্থাদি ক্ষণিকের জন্য বহির্জগতের কোন কোন সময় হইয়া পড়িত। কোন কোন সময় অন্যান্য যে কোন দেবালয়ে লোক ও কোন মূর্তি বিশেষ বলিয়া কথা না, হঠাৎ এ জাতীয় অস্বাভাবিক ভাব প্রকাশ হইত এবং সঙ্গীদের দৃষ্টিতেও আসিয়া পড়িত।

## ভাবানুযায়ী ক্রিয়াদির পরিবর্তন

অষ্টগ্রামে বড় হাওর ( জলাশয় ) আছে। বর্ষাকালে জলে ডোবা থাকে, এপার ওপার দেখা যায় না। ইতিপূর্বে জাগতিক ভাবে সমুদ্র দেখা হয় নাই। পারশূন্য জলময় জায়গা এই প্রথম এইরূপে দেখা। একদিন নৌকায় বিলে বেড়াইতে গিয়াছি দেখি কি আমি ত জল হইয়াও আছি। অনেক সময় মুহূর্ত মধ্যেই এ শরীরের ভাবের ত এইরূপই হইয়া যাইত। শরীরের ভাব জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় মাঝে মাঝে বাহিরে জনতার মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়িত। কিছুক্ষণ সেই সময় শরীরটা আপাদমস্তক কাপড় মুড়ি দিয়া নৌকায় শুইয়া রহিল।

নৌকায় মধুবাবু নামে একজন হাসি তামাসার ছলে বলিয়াছিলেন — ঠাকুরাণীর বুঝি ঘুম পাইয়াছে।

এই সব শুনিয়া প্রশ্ন করা হইল — এই সব অস্বাভাবিক ভাব মাঝে মাঝে কেন প্রকাশ হইত ? মা হাসিয়া বলিলেন — এ শরীরের যে স্বাভাবিক অস্বাভাবিক একই বাবা।

কয়েক বৎসর পূর্বে এ শরীরের ননদ মটরী, একদিন হাসিতে হাসিতে তাহার নিজের বিষয়ে গল্প বলিতেছিল। তাহার নাকি একটা কি রকম অস্বাভাবিক খেলা হইয়াছিল। অষ্টগ্রামে আসিলে একদিন বসিয়া আছি, মটরীর কথা খেয়ালে আসিতেই তাহার ঐ গল্পের কথাটাও খেয়ালে আসিল। খেয়াল হইল — বেশ ত সেই খেলাটা একটু দেখিলে মন্দ কি ? সাথে সাথেই তামাসার মত সেই খেলাটা বেশ দেখা গেল। কোন সময় বেশ দেখা যায় — যে ভাব সম্মুখে আসে ও যদি খেয়াল হয়, তদ্রুপ খেলা দেখা হইয়া যায়। যেমন কোন কোন সময় সাধকের অবস্থায় দেখিল কীর্তন খুব জমিতেছে, কীর্তনের ভাবে শরীরটা বেশ ভাবিত হইয়া গেল। কিংবা মুসলমান ধর্মভাব নিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে — কবরে গিয়া শরীরটা নমাজ পড়িয়া আসিল। আবার কোন সময় দেবপূজাদি যখন সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, দেখা গিয়াছে যে সে জাতীয় ভাব ক্রিয়াদি নিয়া সেই ভাবেই শরীরটা ভাবিত হইয়াছে।

একদিন এ শরীরকে যে মাসীমা বলিত, তাহার একটি ৪/৪½ বৎসরের ছেলে আমাদের ঘরে আসিল, তাহারা তুলসীতলায় সামান্য নাম করিয়া লুট দিত। পূর্ব দিন তাহাদের ঐ রূপ লুট হইয়াছে। পরদিন সকালে ছেলেটি আমাদের ঘরে আসিয়া মাসীমা বলিয়া ডাকাতে আমি বলিলাম — 'বল হরিবোল'। ছেলেটিও সঙ্গে সঙ্গে বলিতে লাগিল 'বল হরিবোল'। পর পর এক একবার দুইজনের বলাবলিতে ছেলেটার কেমন একটা ভাব হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া তাহাদের বাড়ীর একজন বলিয়াছিল — এইরূপ বলা বোধ হয় ঠিক না। শিশুটি নাম বন্ধ করায় কেমন একটু হইয়া গেল। পরে কিন্তু শরীরটাকে দেখিলেই শিশুটি 'বল হরিবোল' বলিত।



## দৈব ঔষধ

অষ্টগ্রামে মিলিয়া মিশিয়া বেশ কয়েকদিন চলিতেছে। এমন সময় একবার খুব অসুখ হইল। চলাফেরা অপরের সাহায্য ব্যতীত কঠিন হইল। ভোলানাথ নিজে পাক করিয়া খান ও খাওয়ান। কিছুদিন পর্যন্ত এই অসুখ ভাবটা ছিল। সেই সময় একদিন বৈকালে বসিয়া খেয়াল হইল দৈব ঔষধ কেমন করিয়া পায় সেই খেলাটা দেখা যাক না। তখনই দেখি একটা বড় ফড়িং মুখে করিয়া একটা কাঁচা পাতা আনিয়া আমার বিছানার কোনায় রাখিয়া দিল। আমি পাতাটি হাতে করিয়া দেখিলাম স্থানীয় কোন পাতার সহিত মিলান গেল না এবং কোন চেষ্টাও আসিল না। পরে হিমালয় পাহাড়ে ঘুরিবার সময় কোন কোন জায়গায় ঐ পাতা দেখিয়াছি। এ কথা এ পর্যন্ত কাহাকেও বলা হয় নাই। এ শরীরের এইরূপই হয়। সব সময় সব কথা বলিবার খেয়াল হয় না। ভিতরে থাকিলেও মুখে বাহির হয় না।

## ঘর বাড়ীর পরিচ্ছন্নতা ও শুচিতা

আবার একদিন মা বলিতে লাগিলেন ঘরের ভিতর বাহির এত পরিষ্কার রাখিতাম যে কোন একটি কুটাও দেখা যাইত না। প্রত্যহ সন্ধ্যায় ধূপবাতি নিয়া গৃহটি প্রদক্ষিণ করিতাম। চাকর থাকা সত্ত্বেও সকাল বেলা উঠিয়া নিজের হাতে গৃহস্থের সকল নিত্যকর্মাদি নিয়মিত পালন করিতাম। এখানে ও অন্যান্য ঘরেও মেয়েদের প্রত্যহ তুলসী প্রণাম করা, তুলসী তলায় ধূপ বাতি দেওয়া, হরির লুট দেওয়া প্রভৃতি নিয়মাদি ছিল। মাসীমার ঘরে শ্রীকৃষ্ণের যুগল মূর্তি ও কালীর বাঁধান ছবি ছিল। তিনি ঐ ছবিগুলি পূজা করিতেন।

## তুলসী-তলায় কীর্তনে মা

মা আরও বলিলেন — ঘরের নিকট একটি তুলসী গাছ লাগাইয়াছিলাম। প্রত্যহ ঐটি স্নান করাই, ফুল দিয়া সাজাই, চারিদিকে লেপি ও ধূপবাতি দিই। ইহা দেখিয়া কেহ কেহ বলিল তুলসী

সেবা ত যতির আচার। সধবায় তুলসী সেবা করিতে পারে না। তাহাদের বলিলাম — ঠাকুর সেবায় কি কাহারো বাধা থাকিতে পারে? তাঁহার কাছে সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সবাই এক। মধুবাবুর স্ত্রী একদিন বলিল আপনার হাতের শাঁখা ধোওয়া জল যেন তুলসী স্থানে না পড়ে, নিয়ম শঙ্খ ধোয়া জল নাকি তুলসীকে দেয় না। প্রথমে আপনার হাতের শাঁখাকে প্রণাম করিয়া তাহার পর তুলসী প্রণাম করিবার নিয়ম। উত্তরে বলিলাম — বেশ তাহাই হইবে। সে অবধি তাহাই করিতাম।

রান্নার সময় যখন চাল নেওয়া হইত তাহা হইতে প্রতিবারে একমুঠা চাল তুলিয়া রাখিতাম। ১০/১২ সের জমিলে ভোলানাথ চালের বদলে পয়সা দিতেন। ঐ পয়সা দেবকর্মে, গরীব দুঃখীকে দানে বা হরির লুটে ব্যয় হইত।

একদিন ভোলানাথকে বলিলাম আমাদের তুলসী তলায় আজ হরির লুট দাও। ভোলানাথ স্বীকার করিলেন এবং হরকুমারকে ডাকিয়া বলিলেন। সে এবাড়ী ওবাড়ী সকলকে জানাইল। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। অল্প দূরে এক শিবালয় ছিল। তথায় রোজই একটু কীর্তন হইত। সেদিন ঐ কীর্তন শুনিয়া হরকুমার তাহাদিগকে ডাকিতে গেল। তাহারা বলিল এখানকার কীর্তন শেষ করিয়া আমরা আসিতেছি, আপনি যান। হরকুমার ফিরিয়া আসিয়া, যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহাদিগকে নিয়া কীর্তন আরম্ভ করিল। ইতিমধ্যে শিববাড়ীর দলও আসিয়া মহানন্দে এ কীর্তনে যোগ দিল। তখন মধুবাবুর স্ত্রী অসুস্থ ছিল। আমি তাহার বিছানায় বসিয়াছি ও বেড়ার ফাঁক দিয়া সব দেখিতেছি এমন সময় দেখিতে পাই সমস্ত বাড়ীটা অত্যুজ্জ্বল আলোতে ভরিয়া উঠিয়াছে। আর এ শরীর আনন্দে ভরপুর হইয়া ঐ আলোর সঙ্গে মিশিয়া কীর্তনের স্থানে। এদিকে ঠিক ঐ সময় এ শরীরটা মধুবাবুর স্ত্রীর খাটিয়া হইতে মাটিতে পড়িয়া যায়। হাতের শাঁখা ভাঙ্গিয়া যায় এবং একটু গড়াগড়ির মতনও হয়। পরে সমস্ত শরীর এলাইয়া অবশ হইয়া পড়ে। এ শরীরের বাহিরে হুঁশের প্রকাশ নাই কিন্তু অজ্ঞান নয়। এ শরীরকে পড়িতে দেখিয়া ঐ রোগিণী কাহাকে ডাকিয়া বলিল। ভোলানাথ ও তাহারা আসিয়া ঐ রূপ অবস্থা দেখিতে পাইলেন। সকলে বলিতে লাগিল খুশীর মার ফিট্ হইয়াছে। চোখে মাথায় জল দিল, উঠাইয়া বসাইল, তখনও শরীর কাঁপিতেছে।



সর্বাঙ্গে যেন আনন্দের ঢেউ খেলিতেছে। ঐ অবস্থা নিয়া তথায় কোনমতে বসিয়া রহিলাম। কীর্তন শেষ হইলে ঘরে গেলাম। ভোলানাথ এইরূপ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে প্রসঙ্গ তাহাকে বলিতেও শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। কথা বলিবার ভাব নাই; ধীরে ধীরে কিছু জানাইলাম। কীর্তন শুনিয়া এইরূপে পড়িয়া যাওয়া এই প্রথম দেখিলাম। এর পূর্বে কীর্তনে কাহাকেও পড়িয়া যাইতে দেখাও হয় নাই।

আর একদিনও তুলসী-তলায় কীর্তন হইল সে সময় এ শরীর নিজের ঘরে ছিল। ভোলানাথ মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিয়া যাইতেন। ঐ দিনও পূর্বের মত অবস্থা হইয়া পড়িয়া যাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার উঠিয়া উন্মাদের মত বাহিরে ছুটিয়া কীর্তনে যাইবার ভাব হয়। ভোলানাথ ধরিয়া রাখেন। ঘরে থাকিয়াই এ শরীরের কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাম চলিতে থাকে। সর্বাঙ্গ লুটাইয়া মাটিতে গড়াইতেছিল। ভোলানাথের শক্তিতে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। কীর্তনের পর শরীরের ভাব আগেকার মত সর্বাঙ্গ অবশ। আমাকে ভোলানাথ বিরক্তি সহকারে বলিলেন — আবার এইসব কি হইতেছে, লজ্জার কথা। আমি কি বলিব, চুপ করিয়া রহিলাম। এ কারণে কিছুদিন কীর্তনাদি বন্ধ রাখা হয়।

## গগন সাধুর কীর্তনে

পরে আরেকদিনের ঘটনা এই, নিকটবর্তী গ্রামে গগন নামে সাধু প্রকৃতির লোক আসে। ভোলানাথ কাছারি হইতে আসিয়া বলিলেন, আজ সন্ধ্যায় আমাদের এখানে গগন সাধুর কীর্তন হইবে। কীর্তনের পর সে এখানে খাইবে। রান্নার ব্যবস্থা কর। পাক তাড়াতাড়ি সারিয়া যে ঘরে কীর্তন হইতেছিল তাহার পিছনের আঙ্গিনায় খোলা স্থানে এক চৌকির উপর আরও ৪/৫ জন সহ আমিও বসিলাম। সেখান হইতে কীর্তন বেশ শুনা যায় লোকজন দেখা যায় না। ঘরে বাঁশের দুয়ার, এ কারণে খাবার জিনিষগুলি ঠিক আছে কিনা দেখিবার জন্য বাহিরে ভিতরে মাঝে মাঝে কেমন একটা ভাব নিয়া ছেলে-মানুষের মত ছুটাছুটি করিয়া যাওয়া আসা করিতেছিলাম। ইহার ভিতর কোন্ সময় যে চৌকির উপর হইতে পড়িয়া গিয়াছি কেহই

বলিতে পারে না। উপরে খোলা আকাশ, গ্রাম দেশ। সকলেই চলিয়া গিয়াছে, কেবল এক বৃদ্ধা তাহার নাতি ঘুমাইয়াছিল বলিয়া আপন মনে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। কীর্তন শেষ হইতে হইতে অনেক রাত্রি হইল, সকলেই যার যার ঘরে চলিয়া গেল। ভোলানাথ ঘরে আসিয়া দেখেন এ শরীর ঘরে নাই বাতি জ্বলিতেছে। এ শরীরের নিজের ভাবের এত গভীরতা ছিল যে হয়ত তখন দরজাটিও ভাল করিয়া বন্ধ করা হয় নাই। কুকুর দরজা ঠেলিয়া ভিতরে আসিয়া নাকি সব খাবার নষ্ট করিয়াছে। ভোলানাথ রাগ করিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। এদিকে সে বৃদ্ধা অনেকক্ষণ হইতে এ শরীরকে ডাকাডাকি করিয়া হয়রান হইয়া টানাটানি করিতেছিল। এ শরীর ধরিয়া তাহার অন্য রকম বোধ হইতেছিল। যেন স্বাভাবিক নয়। মৃতের মত। সে তখন ডাকিয়া বলিল—দেখুন আপনাদের খুশীর মা'র কিরূপ অসাড় অবস্থা, সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। ভোলানাথ ও আরও দুই তিন জন আসিয়া উঠাইবার অনেক চেষ্টা করিল। না পারিয়া ধরাধরি করিয়া ঘরে আনিয়া বিছানায় রাখিয়া দিল। ভিন্ন বন্দোবস্ত করিয়া কীর্তনীয়াদের খাওয়ান হইল ও তাহাদের বিদায় করিয়া দিতে রাত্রি ভোর হইল। এ শরীর আর নড়ে না। পাথরের মত একই অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া ভোলানাথ ভাবিত ও ভীত হইলেন। যাহাকে সামনে পান তাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন — কি করিব? কোনদিন ত এইরূপটা হয় নাই। আবার কীর্তন করিবার জন্য কেহ পরামর্শ দিল। সকলে একমত হইয়া গগন সাধুকে ডাকিয়া আনিল। সে সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিল — কাল রাত্রে কেন বলেন নাই? আমার খুব সৌভাগ্য যে আমার কীর্তনে এইরূপ ভাবাবস্থা হইয়াছে। সে আনন্দের সহিত রাত্রে যে পালা গাহিয়াছিল, তাহাই তখন আরম্ভ করিল। এ শরীরকে নিয়া কীর্তন ঘরের এক পাশে রাখিয়া দিল। কীর্তন শেষ হইতে হইতে প্রায় বেলা ৪টা।

শুনিয়াছি ভাবদশা হইতে ব্যুত্থানের সময় শুদ্ধ ভগবৎ ভক্তের যে সমুদয় সাত্ত্বিক ও আঙ্গিক বিকার পরিলক্ষিত হয় বলিয়া শাস্ত্রাদিতে উল্লেখ আছে, তাহা পূর্বে ও পরে শরীরের চেতনার সঙ্গে সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইয়াছিল। গগন সাধু ও আরও আরও নাকি কত লোক চোখের জলে ভাসিয়াছিল। যাহারা দেখিয়াছে ও এ শরীর ধরিয়া আনিয়াছে



তাহারা আনন্দে চোখের জলে ভাসিয়া তাহাদেরও কিরূপ ভাব হইয়া গিয়াছিল। ঐ সময় ঐ জায়গার ভাবধারা যেন অন্যরূপ ধারণ করিয়াছিল বহুক্ষণের জন্য। শুনিয়াছি গ্রাম শুদ্ধই একটা আলোড়ন পড়িয়া গিয়াছিল। ঐ স্থানটিতেও নাকি ঐ সময়েতে এক নূতন ভাবের বিস্তার হইয়াছিল। যে আসিত তাহারই কেমন একটা ভাব।

## কীর্তনে গৌর নিতাই

পরে সারদা (জয়শঙ্করবাবুর ছেলে) এ শরীরকে জিজ্ঞাসা করিল কীর্তনে আপনি কি দেখিলেন? আপনার কেন এমন হইল? তখনও শরীর অস্বাভাবিক। আপনা আপনি চোখ দিয়া জল প্রবল ধারায় গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। মুছিলেও মুছা যায় না। এ শরীর উত্তরে বলিল — কীর্তন যখন রাত্রে আরম্ভ হইয়াছিল এবং কীর্তনীয়ারা — এসো হে গৌর নিতাই বলিয়া গাহিতেছিল তখন ঘরে আসা যাওয়ার সময় দেখিতেছিলাম গৌর নিতাই দুইজন বালক বেশে কীর্তনে। বালকদের কোথা হইতে প্রকাশ এই প্রশ্নের উত্তরে বলা — 'এই হইতেই' (নিজকে দেখাইয়া)। তখন সারদার কাছে বলিবার ভাবটা হয় নাই। সেই সময়ও বাহিরের কর্মের গতির প্রকাশ ছিল। কৃষ্ণলীলা পালা গাহিবার সময়ও ছোট বালকের মতো ছুটাছুটির ভাব এ শরীরে প্রকাশ পাইয়াছিল। বাহিরে বসিতে বসিতে ক্রমশঃ হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া আসিতে লাগিল এবং কেমন হইল, এই শরীরটা যেন কীর্তনে এক বিশেষ ভাবেও সকলের সঙ্গে মিলিয়া আছে। এইসব ভাব যে কি বুঝাইবার ভাব আসিতেছে না। ভাষাই বা কোথায়?

দ্বিতীয়বার যখন কীর্তন হইতেছিল, তখন বহির্দৃষ্টির ক্রিয়ার দিকটা ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে সকলের সহিত একই, আবার বিশেষ ভাবেও আছি, এই প্রকাশও দেখাইতেছিল। প্রথমে গায়ে কাপড় দিবার ভাবই ছিল না, সকলকে দেখা সত্ত্বেও, ভিন্ন ভাব প্রকাশ ঐ সময় আর কোথায়। ক্রমে ক্রমে গায়ে কাপড়াদি ঠিক করিয়া দেওয়া হইল। ইহার পরও তিন চার দিন পর্যন্ত ঢুলু ঢুলু নেশার ভাব ছিল। কথা বলিবার সময়েও একটা অস্বাভাবিক আনন্দ বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িত।

আর একদিন মামীমার বাড়ীতে কীর্তন হয়। এ শরীরকে দেখিয়া রাখিবার জন্য ভোলানাথ একটি স্ত্রীলোককে নাকি গোপনে বলিয়া দেন। কীর্তনের নিকট হইতে অনেক দূরে একটি ঘরে, নিত্য যেমন সাধারণ ভাবে বসিয়া থাকি সেদিনও তেমনি বসিয়াছিলাম। এই সময়ে বিদ্যুতের মত একটি স্পর্শ যেন নিজের ভিতর হইতে জাগরিত হইয়া ফুটিয়া বেশ সুন্দর স্থির একটি আসনে বসিয়াছিল। কিন্তু দেখিলাম কীর্তন যতক্ষণ চলিতেছিল, একই ভাবে শরীরটা স্থির হইয়া পাথরের মত অনড় রহিল দীর্ঘ সময়। পরে কেহ আসিয়া ধাক্কা দিল, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। তাহার অনেক পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিলাম। শরীর অবশ, কিন্তু আনন্দে ভরপুর প্রকাশ বাহিরেও।

ইহার পর একদিন অন্য বাড়ীতে যখন গগন সাধুর কীর্তন হয়। এ শরীর গিয়াছে, শরীরের ভাবের একটু পরিবর্তনের দরুণ তাড়াতাড়ি কোন রকমে বাসায় চলিয়া আসিতে পারা গিয়াছিল। প্রথমেই তুলসী তলায় কীর্তন হইতে দেখিতেছিলাম যে নাম কীর্তন কানে আসিলেই শরীর অস্বাভাবিক হইয়া যাইত। জোর করিয়া ভিতরের ভাব চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেও শরীর আর মানিতে চাহিত না। কি এক ভাবে ভাসাইয়া লইয়া যাইত।

একদিন দূরে কোথাও কীর্তন হইতেছে, মধুবাবুর মেয়ে আমার কোলে ছিল, তাহাকে নিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইতেই, ভোলানাথ ধরিয়া ফেলিলেন। সেটা কেমন ? শরীরটা ঢলিয়া পড়িতেছে, হাত খুলিয়া মেয়েটি পড়িয়া যাইতেছে। শরীর একেবারে অবশ যেন সর্বাঙ্গ ঢলিয়া গলিয়া পড়িতেছে। গগন সাধুর কীর্তনের পর হইতেই ভাবাদি বিশেষরূপে দেখা যাইত। এক একদিন এক এক রকম হইত।

পূর্বে ছেলেরা যখন হরির নাম করিত, তখন তাহাদিগকে কোন কোন সময় বলিতাম — দেখিস্ দশায় পড়িস্ না। কিন্তু তখনও দশায় পড়া যে কিরূপ দেখা দূরে থাকুক, তাহা কাহারও কাছে শোনাও ছিল না। কাহাকেও সেইরূপ অবস্থায় দেখি নাই।

অষ্টগ্রামের স্থানীয় লোকগুলির মধ্যেও কীর্তন করার ভাবগুলি বেশ ছিল। উপস্থিত যখন পাড়া পড়শীরা আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপের সহিত বলাবলি করিতে লাগিল যে উহার দশা হয়, তখন



হাসি পাইল। সবই ত খেলা, খেলা ছাড়া ত কিছুই নাই। লোকে জানে না বোঝে না তাই এইরূপ নানা ভাবে এই শরীরের সম্বন্ধে কথা বলে। কীর্তনে যখন এই শরীরের উক্ত অবস্থাদি প্রকাশ পাইতে লাগিল, তখন বিদ্যাকূটে খবর গিয়াছিল যে এ শরীরের হিষ্টিরিয়া হইয়াছে। শরীরের পিতামাতা সেই রোগের ঔষধ খুঁজিয়া চিঠি দিয়াছিলেন। ভোলানাথ উত্তরে লিখিয়া দিয়াছিলেন — হিষ্টিরিয়া নয়, সে ভালই আছে।

## ভাগবত শ্রবণে জ্যোতির প্রকাশ

সারদা একদিন ক্ষেত্রবাবুর স্ত্রীকে বলিল আপনারা যদি ভাগবত শুনিতে চান তবে খাওয়া দাওয়া সকাল সকাল সারিয়া আমাদের ঘরে আসিবেন। আমি আজ ভাগবত পাঠ করিব। সেইদিনই প্রথম একটু ভাগবত শোনা। আমরা সেখানে যাইয়া ভাগবত শুনিতেছি, দেখি কি এই শরীর দিয়া বিদ্যুৎ চমকাইবার মত অস্বাভাবিক ভাব এবং বিজলী বাতির আলোর মত প্রকাশ পাইতেছে — কেমন জানি এক রকমটা। হাত পায়ের আঙ্গুল ঠাণ্ডা ও শরীর অবশ। কেমন একটা অস্বাভাবিক অবস্থা। ঘোমটা টানিয়া 'আমি যাই' বলিয়া ঘরের থাম ও বেড়া ধরিয়া ধরিয়া কোনমতে ঢুলিয়া ঢুলিয়া ঘরে আসিয়া চুপচাপ শুইয়া পড়িলাম। খানিক পরে সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ চমকানোর মত আলো ও অস্বাভাবিক ভাবটা কমিয়া গেল, কিন্তু অসাড় ও ঢুলু ঢুলু ভাবটা অনেক সময় পর্যন্ত ছিল। এইরূপ হইলে অনেক সময় পর্যন্ত থাকিত।

ইহার পর আর একদিন সারদা সাধু প্রসঙ্গ নিয়া কথাবার্তা বলিতেছিল, তাহার সব কথা আমার কানেও আসিতেছিল না, তবুও শরীরের পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। সর্বদাই শরীরে একটা এলান এলান ভাব মজ্জাগত ভাবে রহিয়া যাইত।

সারদা আমার এই সমস্ত অবস্থা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিত। আমি একদিন তাহাকে বলিলাম — এইরূপ কেন হয় বলিতে পারেন ? সে বলিল — আপনি যখন নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছুই করেন না, তাঁহার নাম ও গুণগান শুনিয়া যাহা হয় সবই ভাল। আপনি আপনার ভাবে চলিতে থাকুন।

## হরিনামে স্বতঃস্ফূর্ত আসনাদি

অনেক সময় চুপ করিয়া কিছুক্ষণ থাকিলে আপনা হইতে হরিবোল মুখে উচ্চারিত হইত ও সঙ্গে সঙ্গে ভাবটা কেমন হইয়া লোমগুলি খাড়া হইয়া উঠিত। ক্রমে ক্রমে শরীর কাঠের মত স্থির হইয়া যাইত। দেহজ্ঞানে বাহ্য প্রকাশ কোথায় লুকাইতে থাকিত। আবার সে সময় দেখা যাইত সবই যেন এক শুন্যময় ভাবের প্রকাশ হইয়া কোথায় মিলিয়া মিশিয়া যাইতেছে। কিছুদিন যাবতই নিজের খেয়ালে হরিনাম শোনার দিকটা কিছু কিছু হইয়াছিল ত। তাহার পর হইতে এইরূপ প্রকাশটা।

একদিন খেয়াল হইল বসিয়া নাম করিব। অন্ধকারে চোখ বুজিয়া বসিয়া মুখে নাম করিতে লাগিলাম। এইরূপ করিতে ইতিপূর্বে কাহাকেও দেখি নাই। ২।৩ দিন বসিবার পর কতক্ষণ নাম চলিলে যেদিকে তাকাই আকাশ ও তারা দেখিতাম। ভোলানাথ কাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, ইহা যোগীর লক্ষণ ও ভাল।

একদিন রাত্রিতে খাওয়ার পর ভোলানাথকে বলিলাম আমি একটু বসিব তুমি ঘুমাও। বিছানায় বসিয়া একটু নাম করিবার সঙ্গে সঙ্গে দেখি ভিতর হইতে শ্বাসের সহিত মিলিয়া হরিবোল উঠিতেছে ও মুখেও নাম হইতেছে। পরে দেখি আমার মুখ ও জিহ্বার যোগ একেবারে বন্ধ হইয়া কেবল শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত নাম চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে শরীরের পরিবর্তনাদি আরম্ভ হইল এবং আপনা আপনি পা গুটাইয়া একটি আসন হইয়া গেল। পরে শুনিলাম ইহা সিদ্ধাসন, তখন দেখি এ শরীর দুলিতেছে, আর দুলিতে দুলিতে আসন অবস্থাতেই চারিদিকে ঘোরা হইতেছে। বেশ আনন্দময় একটা ভাবের প্রকাশ। শক্তিতে যেন ভরপুর। সর্বাঙ্গ দিয়া নাম স্ফুরণ হইতেছে বোধ করিতে লাগিলাম। আর নামের তালে তালে আসন অবস্থায় চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলাম। এমন সময় এ শরীরের একখানি হাত গিয়া ভোলানাথের গায়ে পড়িল। ভোলানাথ চোর মনে করিয়া চমকিয়া হাতটি জোরে চাপিয়া ধরিলেন। পরে এ শরীরের হাত দেখিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে হাতখানি তখন খুব মোটা ও ভারী বোধ হইয়াছিল। ক্রিয়ার গতিকে শরীরের পরিবর্তনের জন্য ভোলানাথ এইরূপ মনে করিয়াছিল।



অষ্টগ্রামে আর একদিন ভোলানাথকে বলি — তুমি শুইয়া থাক, আমি নাম করিতে বসি। আস্তে আস্তে সাধারণ আসনে বসিয়া নাম করিতেছি ক্রমে ক্রমে লোমগুলি খাড়া হইয়া উঠিল। পা দুইটি নিজ হইতে গুটাইয়া পদ্মাসন হইয়া গেল। মুখে নাম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসেও নাম চলিতে লাগিল। শেষে দেখি শরীরটা মহা উৎসাহে ডাইনে বাঁয়ে দুলিতে লাগিল এবং আসন অবস্থাতেই ঘুরিতে লাগিল। যেমন একটি চাকা কেহ একবার ঘুরাইয়া দিলে আপনা আপনি ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ নাম আরম্ভ হইলেই শরীরে এইরূপ ক্রিয়াদি আপন ভাবে হইতে থাকিত। সে সময় এইরূপ খেয়াল হইল যে সাধারণ শরীর একেবারে নাই কিন্তু এইরূপ শক্তি আছে যে আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহাই করিতে পারিব। অবাধ প্রকাশ, যেন এক অপূর্ব আনন্দে বিভোর। হঠাৎ খেয়াল হইল রাত বেশী হইয়াছে। আমার শোওয়া হয় নাই। সুইচ বন্ধ করিবামাত্র বিজলী পাখার যেরূপ গতি হয়, সেইরূপ ভাবে আমার সব ক্রিয়া তখনি আস্তে আস্তে বন্ধ হইয়া গেল। শুইয়া পড়িলাম।

আর একদিন আপন মনে ঐ ভাবে রাত্রিতে অনেকক্ষণ বসিয়া আছি। গৃহ অন্ধকার। দেখি কি ভোলানাথের ভ্রমধ্য (ত্রিপুটি) হইতে একটা জ্যোতি। ঐ লাইন বহুদূর অবধি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই আলো একটু সময়ের জন্য বাহির হইয়া তখনই মিলাইয়া গেল। উহাতে তাহার সমস্ত মুখ চোখ দেখা গিয়াছিল।

পূর্বে যখন আমি নরুন্দি ছিলাম, তখন তথায় একদিন রাত্রে মালগাড়ীতে গাড়ীতে ধাক্কা লাগিয়া গাড়ীগুলি লাইন হইতে পড়িয়া যায়। তাহার পরদিন দেখি মাটি হইতে লাইনে গাড়ী কল দ্বারা এক একটি করিয়া উঠান হইতেছে, প্রত্যেকবারই ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ হইতেছে। অষ্টগ্রামে একদিন রাত্রে সাধারণভাবে মাটিতে বসিয়া 'হরিবোল হরিবোল' করিতে করিতে বোধ হইল শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে আপনা আপনি একই তালে নাম হইতেছে। তখন দেখি জিহ্বায় নাম বন্ধ হইয়া শরীর স্থির ভাবে সোজা হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ঐ রূপ কল তুলিবার সময় যেইরূপ ঠক্ ঠক্ শব্দ হইয়াছিল, সেইরূপ কোমরের মাঝের দিকে মেরুদণ্ড বরাবর মাঝখানে এক একটি শব্দ হয়। আর আমি যেন মাটিতে থাকা সত্বেও একটু একটু করিয়া উপরের দিকে উঠি। এই রকম কয়েকবার শব্দ হইলে

শ্বাস উপরের দিকে যাইয়া কতক্ষণ বন্ধ হইয়া রহিল। মেরুদণ্ড টান হইয়া হাত পা গুটাইয়া বসা অবস্থায়, পরে আস্তে আস্তে নীচের দিকে শ্বাস পড়িতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীর একটি বিশেষ আসনে স্থির, যেন স্ক্রু আঁটিয়া স্থানে স্থানে সমস্ত অঙ্গ স্থির করিয়া বসাইয়া রাখিয়াছে। জ্ঞান ত অটুট। খেয়াল হইলেও শরীর যেন নড়িতে পারে না। সেইরূপ নড়িবার পাকা খেয়ালও আসে না, অথচ কোন অসুবিধার চিহ্ন মাত্র নাই। শরীর শান্ত স্থির। পূরক রেচক কুম্ভক মিলিত হইয়া নাম আপনা আপনি বরাবর চলিয়াছিল। কিন্তু আমি সে সময় প্রাণ বায়ুর এইরূপ ক্রিয়াদি সম্বন্ধে কাহারো মুখে শুনি নাই বা দেখি নাই। পরদিন সকালে উঠিয়া দেখিলাম শরীরটা ছাড়া ছাড়া ও হালকা বোধ হইতেছে। একটি আনন্দের ভাব ২।৩ দিন পর্যন্ত বিশেষভাবে ছিল। রেশ থাকিয়াই যাইত। পরে যতদিন নাম করিব বলিয়া বসিতাম, প্রথম দিকে ঐ রকম অবস্থা হইয়া যাইত। পরে নাম চলিত।

মাঝে মাঝে রাত্রে নাম করিতে বসিতাম। সবদিন কাজের ভীড়ে হইয়া উঠিত না। যেদিন নাম করিতাম ক্রিয়াদির সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা নেশাখোরের মত হইয়া যাইত। সে অবস্থায় সংসারের সকল কর্মাদি করিতাম। যখন নাম ভিতরে চলিত, কতক্ষণে রাত্রি হইবে সময় পাইব, কতক্ষণে আবার নীরবে বসিতে পারিব, কেবল এই আকুলতা থাকিত। এইরূপে নামের গতি নানা রকম ভাবের ভিতরের দিক দিয়াও চলিতেছিল।

ভাইদাদা আমাকে এর মধ্যে একখানি সাধু জীবনী দিয়াছিল। এ শরীরের একে ত ভাল করিয়া পড়া হয় না আবার যতটুকু পড়া হইত, পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরের ভাব কেমন হইয়া যাইত। ২।৪ দিন বইখানি পড়িবার চেষ্টা করিয়া পরে রাখিয়া দিয়াছিলাম। সে একদিন ঢাকা যাইবে বলিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম আপনার আজ যাওয়া হইবে না। কিন্তু সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। কিন্তু ষ্টীমার না পাইয়া ফিরিয়া আসিল। সে বিদেশে গিয়া মাঝে মাঝে চিঠি দিত আমিও সময়ে সময়ে ভোলানাথের আদেশে আমার অবস্থাদি তাহাকে লিখিতাম। অনেক বৎসর পর কলিকাতায় অল্প সময়ের জন্য তাহার সহিত দেখা হইয়াছিল। পরে আমি ঢাকা সাহবাগে থাকিতে একবার



আসিয়াছিল ও আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল — আপনার এইরূপটি কেমন করিয়া হইল ?

জ্যৈষ্ঠ মাসে অষ্টগ্রামে আসিয়া প্রায় এক বৎসর ৪ মাস সেখানে থাকি। প্রথম ২।৩ মাস সকলের সহিত নূতন আলাপ পরিচয়ে কাটিয়া গেল। প্রায় ৭।৮ মাস শারীরিক অসুস্থতা ও ক্রিয়াদির ভাবে কাটে। বাকি কয়েক মাস কীর্তন ও নামের ভাবে অতিবাহিত হয়।